নির্বাচনী বন্ড ও ভারতীয় রাজনীতিতে দিকবদলের নিশানা

মৈত্রীশ ঘটক ও অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

গোড়ার কথা

নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থাটি শুরু থেকেই বিতর্কিত। এই ব্যবস্থার নৈতিকতার এবং গণতন্ত্রে তার বিরূপ প্রভাবের প্রশ্ন তুলে বিভিন্ন সময়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সংগঠন। তারই ফলস্বরূপ, এই বছর জাতীয় নির্বাচনের কয়েকমাস আগে আদালতের নির্দেশে এই ব্যবস্থাটি রদও হয়ে যায়।

অথচ, বিভিন্ন সংস্থার রাজনৈতিক অনুদানের ইতিহাস নতুন কিছু নয়। ইদানীংকালে নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের হিসেব দেওয়া বাধ্যতামূলক করার পরে বড় ব্যবসায়ীদের অনুদানের পরিমাণ নিয়ে তথ্য এখন সহজলভ্য। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম (এডিআর)-এর মতো সংস্থাগুলি তথ্য জানার অধিকার (আর. টি. আই.) আইনের মাধ্যমে সেই সব তথ্য প্রকাশও করে চলেছেন নিয়মিত। আর এই সব অনুদানের পরিমাণ যখন হাজার কোটি টাকার অঙ্ক ছুঁয়েছে দেখা যায়, সেখানে আদর্শের অতিরিক্ত লাভ-ক্ষতির হিসেব থাকাটাই স্বাভাবিক মনে হয়। নির্বাচনী বন্ড প্রচলনের অনেক আগে থেকেই রাজনৈতিক দলগুলি যে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের থেকে বড়ো অঙ্কের অর্থসংগ্রহ করে এবং তাদের পরিচালিত সরকার সেই অনুদানের বিনিময়ে নানারকম সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেয়, তা নিয়ে জনমানসে কোনো সন্দেহ নেই। তবে, কত টাকা অনুদানের বিনিময়ে কে ঠিক কী সুবিধে পাচ্ছে তা যাচাই করা মুশকিল— যতই হোক, গোটা ব্যাপারটাই যেহেতু আইন এবং নিয়মকানুনের আড়ালে হয়, তাই সম্পূর্ণ ছবি কখনই জানা যায় না। কিন্তু তাহলে নির্বাচনী বন্ড নিয়ে এই যে

প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ঝড় দেখা গেল, তার কারণ কী? যে সমাজ রাজনৈতিক অনুদানের পরিবর্তে সরকারি সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নিয়ে তত বিচলিত আর হয় না, নির্বাচনী বন্ড নিয়ে কেন সে নৈতিকতার প্রশ্নে মুখর?

আমাদের মতে তার দুটি নির্দিষ্ট কারণ আছে। তার মধ্যে প্রথমটি এই বন্ড ব্যবস্থার প্রেক্ষিত— গত এক দশকে কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠী যেভাবে সংসদ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে বাড়তি সুবিধা পেয়েছে তা নিয়ে জনমানসে অসন্তোষ জমা হচ্ছিল এবং আমাদের দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠছিল। এই পরিস্থিতিতে বন্ডের প্রচলন গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকদের শঙ্কিত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থা নিয়ে শঙ্কার দ্বিতীয় কারণ তার কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। অন্য অনুদানের সঙ্গে বন্ড অনুদানের বড় পার্থক্য দুটি : এক, বন্ডের ক্ষেত্রে দাতার নাম গোপন থাকে; আর দুই, বন্ডের অনুদানের ক্ষেত্রে কোনো উর্ধ্বসীমা নেই। অর্থাৎ, যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যে-কোনো অঙ্কের একটি বন্ড কিনে তাঁর পছন্দের পার্টিকে দিতে পারে এবং সেই পার্টি বন্ডটি ভাঙিয়ে সেই টাকা নিজের তহবিলে ভরতে পারে। সেই টাকা কোনো শিল্পপতির পকেট থেকে এল নাকি কোনো লগ্নিকারী সংস্থা, না নিতান্তই একজন সাধারণ সমর্থকের পকেট থেকে এল তা জানার কোনো উপায় নির্বাচনী বন্ডের ক্ষেত্রে নেই। বন্ডের এই দুই বৈশিষ্ট্যের সুযোগ নিয়ে বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের টাকার বিনিময়ে সরকারের থেকে অন্যায় সুবিধা নেওয়ার পথ যে আরো প্রশস্ত হল, নির্বাচনী বন্ড নিয়ে এই আশঙ্কাকে অমূলক বা রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট তা বলা যায় না।

এখানে বলে নেওয়া ভালো যে বন্ড ব্যতীত অন্য অনুদানের ক্ষেত্রে এই দুটি নিয়ম ভিন্ন। অ-বন্ড অনুদানে শুধুমাত্র ২০,০০০ টাকার নীচের অনুদানের জন্য দাতার পরিচয় জানানোর প্রয়োজন পড়ে না। এছাড়াও কর্পোরেট অ-বন্ড অনুদানের ক্ষেত্রে শেষ তিন বছরের নেট মুনাফার ৭.৫% পর্যন্তই অনুদান দেওয়া যায় এবং তাও করা যায় বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের অনুমোদনক্রমে। তবে উল্লেখ করা উচিত যে ২০১৭-এর পরে এই ৭.৫% উর্ধ্বসীমার নিয়মটি তুলে দেওয়া হয়।

বন্ড ব্যবস্থা প্রচলন তাই এরকম একটা শঙ্কার জন্ম দেয় যে টাকার বিনিময়ে সুবিধা নেওয়ার যে ব্যবস্থায় কিছুটা অন্তত লাগাম ছিল, এই ব্যবস্থা তাকে বেলাগাম করে দেবে। নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে টাকা দেওয়ার পদ্ধতি তাই জনমানসে প্রতিফলিত হয়েছে দুর্নীতিকে আইনসিদ্ধ করার প্রচেষ্টা হিসেবে, এবং তাই সাধারণ মানুষের কাছে তার (অ)নৈতিকতা সমাজমান্য নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করে

গেছে। এরকম অনেক কিছু চলতে থাকে চারপাশে, এবং তা নিয়ে কিছু করার নেই বলে একরকম মেনে নেওয়াও শিখে যাই আমরা। কিন্তু হঠাৎ প্রকাশ্যে সেই মগ্নমৈনাকের ছবির আভাস পেলে সুপ্ত বিক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসে। শঙ্কা তৈরি হয় যে বন্ডের টাকা নির্বাচনে অনৈতিক সুবিধা করে দেবে বিভিন্ন ক্ষমতাসীন দলকে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সুবিধার সিংহভাগ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র যারা কেন্দ্রে এবং অনেক বেশি সংখ্যক রাজ্যে ক্ষমতায় আছে।

বন্ডের বিশদ আলোচনায় ঢোকার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক তার সময়রেখায়। নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থার আইন চালু হয় ২০১৭ তে, আর ২০১৮ থেকে বন্ড বিক্রি শুরু হয়। সিপিআইএম দল, বিভিন্ন অ-সরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তি ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বন্ড বিক্রিতে স্থগিতাদেশের আর্জি জানায়। ২০১৯-এর পরেও বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনের আগে বন্ড বিক্রি স্থগিত রাখার আর্জি জানানো হয়। কিন্তু বন্ড বিক্রি চলতে থাকে। এরপরে অনেক আইনি চাপান-উতোরের পরে ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারিতে গিয়ে নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থা বাতিল হয় এবং সুপ্রিম কোর্ট ১২ এপ্রিল, ২০১৯-এর পরের সমস্ত বন্ডের তথ্য প্রকাশ করতে স্টেট ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেয়। আমাদের বিশ্লেষণও মূলত এই স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে।

সহজ প্রশ্ন, অজানা উত্তর

আমাদের প্রথম প্রশ্নটি সহজ – নির্বাচনী বন্ডের টাকা কে পায় এবং কেন পায়? অন্যভাবে বললে, নির্বাচনী বন্ডের ফলে ক্ষমতাসীন পার্টিদের কী লাভ হল বেশি?

এই প্রশ্নটির তাৎপর্য একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উঠে আসা মূল অভিযোগটি হল যে বন্ড বেনামি রাজনৈতিক অনুদানের পথ খুলে দিচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন শিল্পসংস্থা ক্ষমতাসীন পার্টিকে আইনি পথে ঘুষ দিয়ে নিজেদের কার্যোদ্ধার করে নেবে। এই সম্ভাবনাটির স্বপক্ষে বিশদ প্রমাণ দাখিল করা কঠিন— কারণ অনুদান ও সরকারি সুবিধার যোগসূত্রটি সরকারি নথির যে গোলকধাঁধায় লুকিয়ে থাকে, তার হদিশ অসম্ভব না হলেও দুরূহ। কিন্তু তাও বন্ডের তথ্য বেরোনোর পরে অনেকেই পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে লোকসানে চলা অনেক কোম্পানি কোটি-কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড কিনেছে। আবার অনেক কোম্পানি তাদের ব্যালান্স শিটে দেখানো লাভের থেকে বেশি টাকার বন্ড কিনেছে, অনেক কোম্পানি বন্ড কিনেছে তাদের দরজায় ইডি-সিবিআই টোকা দেওয়ার পরে।

কোনো সন্দেহ নেই যে বন্ড অনুদানের কারণ হিসেবে সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য অনুমান হল তা একধরণের বিনিয়োগের মতো— ক্রেতা নিশ্চয়ই আশা রাখেন যে এই অনুদানের বিনিময়ে যে সরকারি দাক্ষিণ্য পাওয়া যাবে তাতে তাঁদের ভবিষ্যৎ লাভের ঝুলি ভরে উঠবে। কিন্তু আগেই বলেছি যে বন্ড দানের হিসেব পেলেও, প্রতিদানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া মুশকিল। আমরা তাই কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পেশ করব যার অন্যতম হল ক্ষমতাসীন পার্টিরাই টাকা পাচ্ছে কিনা সেটা দেখা। কারণ, যে পার্টি সরকারে আছে তার সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা বেশি। তাই বন্ডের স্বাভাবিক গতিও সেদিকে হওয়াই প্রত্যাশিত।

এই সম্ভাবনা পরীক্ষা করার একটা সমস্যা হল, নির্বাচনী বন্ড যে সময়ে প্রচলিত ছিল সেই সময়ের পুরোটাই ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) কেন্দ্রে এবং অনেকগুলি রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল। এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হিসেব অনুযায়ী তারা একাই মোট বন্ড অনুদানের অর্ধেকের বেশি টাকা পেয়েছে। কিন্তু এতে নিশ্চিত ভাবে এটা বলা যায় না এই টাকার পুরোটাই এসেছে বিজেপি ক্ষমতাসীন পার্টি বলে। অন্তত তাত্ত্বিক সম্ভাবনা হিসেবে এটাও হওয়া সম্ভব যে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা বিজেপিকে টাকা দিয়েছে তাদের অর্থনৈতিক নীতি বা রাজনৈতিক মতাদর্শ তাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবেও কোনো রাজনৈতিক পার্টির ওপর বিনিয়োগ করতে পারে, সেই পার্টি সেই মুহূর্তে ক্ষমতায় না থাকলেও। যেমন, আমেরিকায় কোনো একটি বছরে হয় ডেমোক্র্যাট অথবা রিপাবলিকানরা ক্ষমতায় থাকেন। কিন্তু যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন না তাঁরাও কিন্তু অনুদান পেয়ে থাকেন, ক্ষমতা থেকে সরে গেলেই রাজনৈতিক অনুদান পাওয়া বন্ধ হয়ে যায় না। সেই কারণে বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে টাকা পাচ্ছে, না তাদের নীতি-আদর্শের জন্য পাচ্ছে তা বুঝতে গেলে তাদের ক্ষমতাসীনতার কিছুটা পরিবর্তন দরকার। অর্থাৎ, আমরা যদি ক্ষমতাসীন বিজেপির বন্ড অনুদানের সঙ্গে ক্ষমতায় না থাকা অবস্থায় তাদের প্রাপ্ত বন্ড অনুদানকে তুলনা করতে পারি তাহলে বিজেপির ক্ষমতা ও তাদের বন্ড অনুদানের সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের সমস্ত তথ্য ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪-এর মধ্যবর্তী সময়ে, যখন বিজেপি কেন্দ্রে এবং বেশিরভাগ রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল। তাই আমাদের প্রতিপাদ্য যাচাইয়ের জন্য একটু ঘুরপথে যেতে হবে।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, বন্ডের মাধ্যমে কে টাকা দেয় এবং কাদের দেয়? এই প্রশ্নেরই একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন হল, কোন ধরণের রাজ্য থেকে কাদের কাছে

টাকা পৌঁছয়? কোনো রাজ্যের স্থানীয় পুঁজিপতিরা কি মূলত জাতীয় পার্টিদের পেছনে দাঁড়ায় না কি আঞ্চলিক পার্টিরাও এর থেকে সুবিধা পায়?

সবশেষে আমরা বোঝার চেষ্টা করব এই সবটা মিলে কোনো বৃহত্তর ছবি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কিনা। এইখানেই আমাদের দৃষ্টিকোণ, নির্বাচনী বন্ড নিয়ে লেখা অন্যান্য প্রবন্ধের থেকে একটা অন্য পথ ধরবে। নির্বাচনী বন্ড নিয়ে আর বাকি যা লেখা চোখে পড়েছে তার সবই কর্পোরেট অনুদান এবং সরকারি সুবিধার আদান-প্রদানের দিকে ইঙ্গিত করে। কিন্তু এর বাইরেও এই বন্ড পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ ভারতের এক নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চালচিত্রের দিকে দিক নির্দেশ করে। আমরা এই প্রসঙ্গেও আলোকপাত করব।

সংখ্যা দর্শন

আমাদের যাবতীয় বিশ্লেষণের তথ্য দুটি সুত্র থেকে এসেছে— ১) স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই) কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৯ থেকে ২০২৪-এর মধ্যেকার বন্ড সংক্রান্ত সব তথ্য এবং ২) অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম (এডিআর)-এর রিপোর্ট যা ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের তথ্য প্রকাশ করে। এডিআর রিপোর্টের সময়কাল কম। কিন্তু তার সুবিধার দিক হল যে সেখানে বিভিন্ন পার্টির বন্ড এবং অ-বন্ড দু'ধরণের অনুদানের একটা হিসেব আছে। অন্যদিকে, এসবিআই রিপোর্টে, শুধু বন্ড সংক্রান্ত তথ্য থাকলেও তা অনেক বেশি বিস্তারিত ভাবে আছে। বিভিন্ন তারিখে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা, কোন রাজ্য থেকে কত টাকার কোন বন্ড কিনে কোন পার্টিকে দিলেন এবং সেই পার্টি কোন রাজ্যের, কোন শহরের স্টেট ব্যাঙ্কে ভাঙালেন তার বিস্তারিত হিসেব এসবিআই-এর রিপোর্টে আছে। আমরা কীভাবে এই সব তথ্যের বিশ্লেষণ করছি সে ব্যাপারে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

ক্ষমতা টাকার উৎস?

এবার আমরা আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। অর্থাৎ, বোঝার চেষ্টা করব, বেশি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকলেই বেশি বন্ড অনুদান পাওয়া যায় কিনা। মনে রাখতে হবে, ২০১৯-২৪ এর পুরো সময়টাই কেন্দ্রে বিজেপি। তাই আমরা রাজ্যওয়ারি হিসেবটা দেখব।

পার্টির নাম	মোট টাকা (কোটি টাকায়)	মোট বন্ড অনুদানের %	যেসব রাজ্যে ক্ষমতায় (এপ্রিল, ২০১৯ - জানুয়ারি ২০২৪)
বিজেপি	৫৩৮১.০১	৪৫.৮২	আসাম, গুজরাট, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর (২০১৯-জানুয়ারি ২০২৪), হিমাচল প্রদেশ (২০১৯-ডিসেম্বর ২০২২), মধ্যপ্রদেশ (২০২০-২৪ জানুয়ারি), কর্ণাটক (২০১৯-মে ২০২২) , ছত্তিশগড় (ডিসেম্বর ২০২৩-জানুয়ারি ২০২৪), রাজস্থান (ডিসেম্বর ২০২৩-জানুয়ারি ২০২৪)
এআইটিসি	১৫৪৯.৬৭	১৩.২০	পশ্চিমবঙ্গ (২০১৯-জানুয়ারি ২০২৪)
আইএনসি	১৩০১.৬৫	১১.০৮	ছত্তিশগড় (২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৩), মধ্যপ্রদেশ (২০১৯- মার্চ ২০) হিমাচল প্রদেশ (ডিসেম্বর ২২-জানুয়ারি ২০২৪), কর্ণাটক (মে ২০২৩-জানুয়ারি ২০২৪), রাজস্থান (২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৩), পাঞ্জাব (২০১৯-মার্চ ২০২২), তেলেঙ্গানা (ডিসেম্বর ২০২৩-জানুয়ারি ২০২৪),
বিআরএস/ টিআরএস	১১৬৯.৫৫	৯.৯৬	তেলেঙ্গানা (২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২৩
বিজেডি	৭২৪.৫০	৬.১৭	উড়িষ্যা (২০১৯- জানুয়ারি ২০২৪)
ডিএমকে	৬৩২.০০	৫.৩৮	তামিলনাড়ু (মে ২০২১-জানুয়ারি ২০২৪)
ওয়াইএসআর-সি	৩২৭.০০	২.৭৮	অন্ধ্রপ্রদেশ (২০১৯-জানুয়ারি ২০২৪)
টিডিপি	২০৬.৩৩	১.৭৬	
শিবসেনা	১৫১.৩০	১.২৯	মহারাষ্ট্র (২০১৯-জানুয়ারি ২০২৪)
আপ	৬১.৮০	০.৫৩	দিল্লি (২০১৯-জানুয়ারি ২৪), পাঞ্জাব (মার্চ ২০২২-২৪ জানুয়ারি)
এসকেএম	৩৬.৫০	০.৩১	সিকিম (২০১৯-জানুয়ারি ২০২৪)
জেডিইউ	১২.০০	০.১০	বিহার (২০১৯-জানুয়ারি ২০২৪)
জেএমএম	১১.৭৫	০.১০	ঝাড়খণ্ড (২০১৯-জানুয়ারি ২০২৪)
এআইএডিএমকে	৬.০৫	০.০৫১	তামিলনাড়ু (২০১৯-মে, ২০২১)

সারণী ১: বিভিন্ন পার্টির বন্ডে টাকা প্রাপ্তির পরিমাণ এবং তাদের বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার খতিয়ান

এখানে আমরা সব পার্টির নাম রাখি নি। মোট বন্ড অর্থের অন্তত এক শতাংশ অনুদান হিসেবে পেয়েছে অথবা তা না পেলেও অন্তত কোনো একটি রাজ্যে এই সময়ের মধ্যে কিছুদিনের জন্য হলেও ক্ষমতায় ছিল, শুধু এই রকম পার্টিদের এই তালিকায় নেওয়া হয়েছে।

প্রত্যাশিত ভাবেই, তালিকার শীর্ষে রয়েছে বিজেপি। তারা সবচেয়ে বেশি রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে এবং বন্ডে টাকাও পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু বেশি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকলেই যে টাকা বেশি পাওয়া যাচ্ছে, এরকম কিন্তু নয়। কারণ, বন্ডে টাকা প্রাপ্তির নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এআইটিসি (সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস) যারা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় রয়েছে। বিজেপির পরেই সবচেয়ে বেশি রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আইএনসি) । কিন্তু, বন্ডে অর্থপ্রাপ্তির নিরিখে তারা তৃণমূলের পিছনে। অন্যদিকে তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি), ২০১৯ থেকে ২০২৪ এর মধ্যে ক্ষমতায় না থেকেও দুশো কোটির কিছু বেশি টাকা পেয়েছে যা আম আদমি পার্টি (আপ), জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ), ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) বা অখিল ভারত আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম (এইআইএডিএমকে) এই দলগুলোর থেকে অনেকটাই বেশি। অথচ, দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত পার্টিগুলি কিন্তু ২০১৯ থেকে ২০২৪ এর মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল।

রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বন্ডকে বোঝার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা এরকম কোনো উদাহরণ দেখতে পারি যেখানে কোনো পার্টি ২০১৯-২৪-এর মধ্যে কিছু সময় ক্ষমতায় ছিল আর কিছু সময় ক্ষমতার বাইরে ছিল। তাহলে ক্ষমতায় এলে কোন পার্টির বন্ড অনুদান প্রাপ্তি কতটা বাড়ে তা দেখা সম্ভব। আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে এরকম উদাহরণ একটিই আছে— ডিএমকে। ডিএমকে ২০১৯ থেকে ২০২১ ক্ষমতায় ছিল না, তারপর ২০২১-এ নির্বাচনে জিতে তারা তামিলনাড়ুতে ক্ষমতায় আসে। যে-সময় তারা ক্ষমতায় ছিল না সে-সময় তাদের বন্ডে প্রাপ্ত অনুদান ১৮৫ কোটি প্রায় যা মোট বন্ড অনুদানের ১.৫৮%। ক্ষমতায় আসার পরে, ২০২১ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে ডিএমকে পায় ৪৪৭ কোটি টাকা যা ক্ষমতায় না থাকা অবস্থায় পাওয়া অর্থের প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ, ক্ষমতায় থাকলে অনুদান বাড়ে বলে আমাদের যে অনুমেয় প্রস্তাব, তার সাথে এই ঘটনাটি সঙ্গতিপূর্ণ।

ক্ষমতার বাইরে থেকে ক্ষমতায় এসেছে, আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে এরকম উদাহরণ এই একটিই আছে। কিন্তু এরকম আরো দুটি উদাহরণ আছে যাদের ক্ষমতাধীন রাজ্যের সংখ্যা বেড়েছে এই সময়ের মধ্যে— আপ এবং কংগ্রেস। বিজেপিকে আমরা এই আলোচনায় দেখছি না— কারণ, কেন্দ্র ছাড়াও বিজেপি ১০টি রাজ্যে ২০১৯ থেকে ২০২৪-এর পুরো সময়টাই ক্ষমতায় ছিল। আপের উদাহরণটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আপ ২০১৯ থেকে ২০২৪ পুরো সময়টাই দিল্লির ক্ষমতায় ছিল। এর পাশাপাশি ২০২২ সালে আপ পাঞ্জাবে ক্ষমতায় আসে। সুতরাং ২০১৯ থেকে ২০২২ আপ একটি রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল (দিল্লি) এবং

২০২২ থেকে ২০২৪ তারা দুটি রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল (দিল্লি ও পাঞ্জাব)। আপ একটি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সময় প্রায় ১০ কোটি টাকা পেয়েছিল, যা প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে ৫১.৭ কোটি হয় দুটি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সময়। কংগ্রেসের হিসেব আরেকটু জটিল। কংগ্রেস আলোচ্য সময়ের মধ্যে দুটি, তিনটি বা চারটি রাজ্যে ক্ষমতায় থেকেছে। এই রাজ্যগুলিও পরিবর্তিত হতে হতে গেছে যা সারণী ১-এ চোখ রাখলে স্পষ্ট হবে। কংগ্রেস দুটি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সময় পেয়েছে ১৭৪.৩ কোটি টাকা (মোট বন্ড অনুদানের ১.৪৮%) তিনটি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রায় ৪৩৬ কোটি টাকা (মোট বন্ড অনুদানের ৩.৭১%) এবং চারটি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সময় প্রায় ৬৯১ কোটি টাকা (মোট বন্ড অনুদানের ৫.৮৯%) । অর্থাৎ, বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতার বিস্তারের সাথে সাথে নির্বাচনী বন্ড থেকে প্রাপ্তিও বেড়েছে।

অঙ্ক কী কঠিন?

সারণী ১ এবং তৎপরবর্তী আলোচনা ক্ষমতা এবং বন্ড প্রাপ্তির একটি সম্পর্কের আভাস দেয়। বলাই বাহুল্য, সম্পর্কটি সরলরৈখিক নয়। ক্ষমতা বন্ড অনুদানের অন্যতম নির্ধারক, কিন্তু একমাত্র নির্ণায়ক নয়। প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হয়েছে একটা দল কোন রাজ্যে ক্ষমতায় আছে তার অর্থনৈতিক কাঠামো গুরুত্বপুর্ণ। অর্থাৎ শুধু বনের রাজা হলেই তো হল না – বাঁশবন আর সুন্দরবনের রাজার ফারাক বিস্তর। কিন্তু শুধুমাত্র রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফারাক গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমাদের মতে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোর ফারাক। বন্ডে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি শিল্পপ্রধান রাজ্যে ক্ষমতায় থাকলে। সেই কারণে পাঞ্জাব বা ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যে যেখানে উৎপাদন জমিনির্ভর (কৃষি ও খনি), সেখানকার ক্ষমতাসীন পার্টিরা খুব বেশি টাকা বন্ডের মাধ্যমে পায় নি। কিন্তু কেন? এর উত্তরে আমরা একটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনার দিকে দিকনির্দেশ করতে পারি।

যে-কোনো অর্থনৈতিক কাজ দু-ধরণের হতে পারে। এক ধরণের কাজে কোনো উদ্বৃত্ত তৈরি হয় না, যাঁরা এই সব কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাঁদের দিন-আনি-দিন-খাই অবস্থা। অর্থনীতির পরিভাষায় একে সাবসিস্টেন্স বলে। দিন-আনি-দিন-খাই কাজের পৃথিবীতে নির্বাচনী অনুদান, বন্ড, দুর্নীতি কোনো কিছুই সম্ভব নয়। কারণ যাঁরা এই পৃথিবীর বাসিন্দা তাঁরা সেটুকুই রোজগার করেন, যা না করলে জীবনধারণ করা মুশকিল হবে । তাই তাঁদের অনুদান, ঘুষ কিছুই দেওয়ার ক্ষমতা নেই, যদিও মিছিলে যোগ দেওয়া বা যে ধরণের রাজনৈতিক কাজকর্ম শ্রমনির্ভর তাতে যুক্ত হবার মাধ্যমে তাঁরা রাজনৈতিক দলগুলিকে তাঁদের সমর্থন জানাতে

পারেন। অন্য ধরণের কাজে উদ্বৃত্ত (অর্থনীতির পরিভাষায় একে economic rent বলে) তৈরি হয় এবং ঘুষ, তোলা বা রাজনৈতিক অনুদান যাই বলুন না কেন, এই উদ্বৃত্ত থেকেই আসে। এই উদ্বৃত্তকে রক্ষা করার উপায় হল বাজারে প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এসে গেলে এই উদ্বৃত্ত অনেকের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়ে কেউই বিশেষ কিছু পাবে না। যারা এই উদ্বৃত্ত পায় তারা তার একটা অংশ রাজনৈতিক দলগুলিকে দেয় প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। কখনো প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি সংসদে আইন প্রণয়ন করতে পারেন (যেমন পেটেন্ট আইন), আবার কখনও স্থানীয় বাহুবলী নেতা গায়ের জোরে প্রতিযোগিতা আটকে দিতে পারেন (ফুটপাথের ব্যবসায়ী বা অটোরিকশা ইউনিয়নের কথা ভাবুন।)। সবসময় যে এই প্রতিযোগিতা আটকে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত উপার্জন বড়লোকেরা করে থাকেন এরকম কিন্তু নয়। শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরির মাধ্যমেও কিন্তু শ্রমের জোগান আটকে দেওয়া হয় যাতে মালিক আর শ্রমিকের মধ্যে উদ্‌বৃত্তের ভাগাভাগির দর-কষাকষি চলতে পারে।

এখন শিল্পপতি এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে উদ্বৃত্ত ভাগাভাগির এই যে পদ্ধতি, এটি বেশ জটিল এবং স্থানীয় বহুরকমের মানুষ এই প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকেন এবং এই উদ্বৃত্তের একটা ভাগ পেয়ে থাকেন। তার মধ্যে স্থানীয় নেতা, স্থানীয় বাহুবলী ইত্যাদি বহুরকমের লোক থাকেন। বন্ড একভাবে উদ্বৃত্ত ভাগাভাগির এই বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতিটির কেন্দ্রীকরণ করেছে যেখানে শিল্পপতি সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের উচ্চতম স্তরে টাকা পৌঁছে দিতে পারেন নিচের স্তরের লোকদের বাদ দিয়েই। কিন্তু যেসব শিল্পে জমি নির্ভরতা অনেক বেশি অর্থাৎ শিল্পটি ভৌগোলিক ভাবে নির্দিষ্ট, সেখানে স্থানীয় মানুষদের বাদ দেওয়ার কাজটি তত কঠিন, এবং সেই সব জায়গায় বন্ড অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে বলে নেওয়া ভালো, প্রায় সব শিল্পেই জমি লাগে। কিন্তু কৃষি বা খনির ক্ষেত্রে জমি উৎপাদনের একটি উপাদান, যা এই দুটি ক্ষেত্রকে গুণগতভাবে আলাদা করে দিয়েছে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তৃণমূল কংগ্রেস বন্ডে অনেক টাকা পেয়েছে কিন্তু তাদের আমলে পশ্চিমবঙ্গ দেশের শিল্প-মানচিত্র থেকে মুছে গেছে বলে যে একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে, সেই বিরোধাভাসের ব্যাখ্যা কী? এই বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা ২০২১-২২-এর ম্যানুফ্যাকচারিং নেট ভ্যালু অ্যাডেড (এনভিএ)-এর ভিত্তিতে আমরা রাজ্যগুলির একটি র‍্যাঙ্কিং তৈরি করেছি (সূত্রঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া)।[১] সেখানে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছয়। পশ্চিমবঙ্গে ভারতের মোট ম্যানুফ্যাকচারিং

১. ২০২১-২২ নেওয়ার কারণ তার পরের বছরে সব রাজ্যের জন্য এই তথ্য দেওয়া নেই।

নেট ভ্যালু অ্যাডেড-এর ৫.১৮% তৈরি হয়। সারণীর প্রথমে আছে প্রত্যাশিত ভাবে গুজরাট (১৭.৫৬%)। তারপরে একে-একে মহারাষ্ট্র (১২.৯৩%), তামিলনাড়ু (১১.১৬%), কর্ণাটক (৭.৫৯%) এবং উত্তরপ্রদেশ (৬.১৮%)। বাকি সব রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের নিচে।[২] আসলে পশ্চিমবঙ্গ বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রণী রাজ্য না হলেও, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে তার আপেক্ষিক অবস্থান অন্যান্য রাজ্যগুলির তালিকায় ওপরের দিকে।

কোথাকার টাকা, কোথায় গড়ায়

যদিও আমরা তৃণমুলের বন্ড অনুদানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব নিয়ে একটি সম্পর্ক দেখলাম, কিন্তু তৃণমূল বন্ডের যে অনুদান পেয়েছে তার সবটাই যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছে তা কিন্তু নয়। বন্ড অনুদান সংক্রান্ত আলোচনার এটি আরেকটি অপ্রত্যাশিত দিক যা নিয়ে এখন অবধি আমরা কোনো আলোচনা দেখিনি।

বন্ডের টাকার আন্তঃরাজ্য চলাচলের আলোচনায় ঢোকার আগে একটু এসবিআই-এর তথ্যপঞ্জীর বিন্যাসের ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া দরকার। এই তথ্যপঞ্জীতে কোন দিনে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বন্ড কিনে কোন পার্টিকে দিয়েছে এই তথ্য তো আছেই। তার পাশাপাশি আরো দুটি তথ্য আছে – কোন রাজ্য থেকে বন্ডটি কেনা হয়েছে আর কোথায় ভাঙানো হয়েছে।[৩] আমরা মূলতঃ বন্ড কোথা থেকে কেনা হয়েছে সেই রাজ্যের নাম ব্যবহার করেছি আমাদের বিশ্লেষণে। তার একটা কারণ বিজেপি বা কংগ্রেসের মতো জাতীয় পার্টিরা তাদের বন্ড বেশির ভাগ সময়েই ভাঙিয়েছে দিল্লি বা মুম্বাইয়ে। তৃণমূল বন্ড ভাঙিয়েছে কলকাতায়, কখনও দিল্লিতেও। তাই কোথায় ভাঙানো হচ্ছে সেটা থেকে দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চালচিত্র সম্পর্কে খুব কিছু বোঝা সম্ভব নয়। অন্যদিকে কোথা থেকে টাকা আসছে তার থেকে কোন রাজ্যের স্থানীয় পুঁজি কাদের সমর্থন করছে তা বোঝা সম্ভব।

প্রথমে দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেনা বন্ড কোন কোন পার্টির তহবিলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেনা বন্ডের প্রায় ৩৮% গেছে তৃণমুলের ঘরে। এর পরেই আছে বিজেপি (২৪.৩%) আর কংগ্রেস (১৪.৫%)। এতেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

২. আমরা এই এনভিএ-র র‍্যাঙ্ক এবং বন্ডে কোন রাজ্য থেকে কত টাকা এসেছে তার একটা কোরিলেশনও বের করেছি। সেটির মান ০.৬১।

৩. আমাদের আলোচনায় আমরা শুধু ব্যবসায়িক সংস্থার তথ্য ব্যবহার করেছি, ব্যক্তির অনুদানের হিসেব নিই নি। এমনিতেও ব্যক্তি অনুদানের পরিমাণ বেশ কম, বন্ড অনুদানের সিংহভাগই এসেছে সংস্থাদের থেকে।

বাংলার আরেক প্রধান রাজনৈতিক দল সিপিএম আগেই ঘোষণা করেছিল যে তারা বন্ডের টাকা নেবে না, তাই তারা কিছুই পায় নি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেনা বন্ডের প্রায় ১৬% গেছে বিজু জনতা দলের ঘরে যারা পশ্চিমবঙ্গে ভোটেই দাঁড়ায় না! পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেনা বন্ড গেছে প্রায় তেরোটি পার্টির ঘরে, যার মধ্যে ওপরের চারটি প্রধান দল ছাড়াও আপ, ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি, ডিএমকে, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, ওয়াই এস আর (কংগ্রেস) প্রভৃতি পার্টিও আছে।

এ গেল পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে টাকা যাওয়ার গল্প। এবার বাইরে থেকে বাংলায় টাকা আসার ব্যাপারটা দেখা যাক। এদিক থেকে সবথেকে অদ্ভুত হল তামিলনাড়ু। এআইডিএমকে তামিলনাড়ুর অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল। তদুপরি, আলোচ্য সময়ের মধ্যে তারা ক্ষমতাতেও ছিল ২ বছর। তা সত্ত্বেও তারা মাত্র ৬ কোটি টাকা পেয়েছে বন্ড থেকে। তাহলে তামিল পুঁজির অনুদান গেল কোথায়? প্রত্যাশিত ভাবেই তামিলনাডু থেকে বিক্রি হওয়া বন্ডের ৩৫.৫% গেছে ডিএমকে-র কাছে। এছাড়া প্রায় ১৬% গেছে বিজেপির কাছে। সেটাও খুব অবাক করার মতো কিছু না। অবাক করার মতো বিষয় হল তামিলনাডু থেকে বিক্রি হওয়া বন্ডের ৩৪% গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ঘরে! অথচ, তৃণমূল কিন্তু তামিলনাডুর ভোটে প্রার্থীই দেয় না। একই ভাবে, আসাম থেকে কেনা বন্ডের প্রায় ৪৯% গেছে বিজেপির কাছে আর ৪১% গেছে তৃণমূলের ঘরে! কংগ্রেস সেখানে পেয়েছে মাত্র ১০%। তৃণমূল যদিও আসাম থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কিন্তু তাদের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ কংগ্রেসের থেকে অনেক কম। অথচ বন্ডের টাকার বিচারে তারা অনেকটাই এগিয়ে। বিহার থেকে বন্ডের টাকা খুবই কম উঠেছে, কিন্তু যা উঠেছে তা আধাআধি ভাগ হয়েছে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে। কিন্তু এই আন্তঃরাজ্য বন্ড চলাচলের তাৎপর্য কী? এর কোনো নিশ্চিত উত্তর আমাদের কাছে নেই। একটা সম্ভাব্য উত্তর হল এই যে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আন্তঃরাজ্য সংযোগ থাকে। হয় অন্য রাজ্য থেকে তারা কাঁচামাল সংগ্রহ করে বা অন্য রাজ্যে তাদের জিনিস বিক্রি করে। তাই যে রাজ্যে তাদের ব্যবসায়িক সংযোগ আছে সেই রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দলকে তারা চাঁদা দেয়। তবে, বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ফরোয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ সম্পর্কে বিশদ তথ্য না থাকলে এ নিয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা মুশকিল।

গৌরী সেনের সন্ধানে

ফরোয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের নেটওয়ার্কজাল ভেদ করতে না পারলেও এসবিআই প্রকাশিত তথ্যপঞ্জী বন্ড ক্রেতাদের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে আর

তাই আমরা আংশিকভাবে জানি এই গৌরী সেনেরা কারা, যারা বন্ড ক্রয় নিমিত্ত উপুড় করেছে হাজার-হাজার কোটি টাকার ঝুলি।

প্রথম যখন নির্বাচনী বন্ডের তথ্য বেরোতে শুরু করে তখন বিরোধী শিবিরের অনেকেই ভেবেছিলেন যে বন্ড ক্রেতার তালিকায় আদানি, আম্বানিদের নাম থাকবে। কিন্তু আদানির নাম কোথাও পাওয়া যায় নি। আম্বানিদের নাম সরাসরি না থাকলেও রিলায়েন্সের এক সহযোগী সংস্থা কুইক সাপ্লাই বিজেপিকে ৩৮৫ কোটি টাকা দিয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু হাজারের কাছাকাছি (আসলে ৯৪৬) বন্ড ক্রেতা আছে, তার মধ্যে বেদান্ত, জিন্দাল, টাটা, ভারতী এয়ারটেল এরকম কয়েকটিমাত্র নামই আমাদের চেনা। এমনকি আমরা যদি শুধু বিভিন্ন পার্টির সর্বোচ্চ বন্ড ক্রেতাদের দিকে তাকাই তাহলেও এমন অনেক নাম দেখব যাদের নাম সচরাচর শোনা যায় না। যেমন ধরুন ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল সার্ভিসেস। এদের নাম এসবিআই বন্ডের তথ্য প্রকাশ করার পরে প্রথম সংবাদপত্রে আসে। এরা তৃণমূলকে ৫৪২ কোটি টাকা এবং ডিএমকে কে ৫০৩ কোটি টাকা দিয়েছিল। কিন্তু এরা যে শুধু এই দুটি বিজেপি-বিরোধী পার্টিকেই টাকা দিয়েছিল তা নয়। এরা কিন্তু বিজেপিকে ১০০ কোটি, কংগ্রেসকে ৫০ কোটি, এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেসকে ১৫৪ কোটি টাকা দিয়েছে।

রাজনৈতিক পরিসরে পরস্পরের বিরোধী বিভিন্ন পার্টিকে টাকা দেওয়ার এই যে ধরণ এটা কিন্তু বেশির ভাগ বড় বন্ড ক্রেতার ক্ষেত্রেই সত্যি। বিনিয়োগকারীরা যেমন বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারে টাকা লাগিয়ে ঝুঁকি কমান, যাকে পরিভাষায় পোর্টফোলিও ডাইভার্সিফিকেশন বলে, এও যেন অনেকটা সেরকমই একটা ব্যাপার। এছাড়া কোন কোম্পানি কোন পার্টিকে টাকা দেবেন সেটা অনেকটাই নির্ভর করে কোন রাজ্যে সেই কোম্পানির মূল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং সেখানে কোন-কোন পার্টি শক্তিশালী তার ওপর। যেমন হলদিয়া এনার্জি লিমিটেড তৃণমূল কংগ্রেসকে ২৮১ কোটি এবং বিজেপিকে ৮১ কোটি টাকা দিয়েছে। একই ভাবে বেদান্ত লিমিটেড বিজেডিকে ৪০ কোটি, বিজেপিকে ২২৬ কোটি আর কংগ্রেসকে ১০৪ কোটি দিয়েছে। মেঘা এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড একই পথে হেঁটে বিজেপিকে ৫৮৪ কোটি টাকা, ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে ১৯৫ কোটি এবং ডিএমকে-কে ৮৫ কোটি টাকা দিয়েছে। এছাড়াও তারা টিডিপিকে ২৮ কোটি, ওয়াইএসআর কংগ্রেসকে ৩৭ কোটি, জেডিএস-কে ৫ কোটি আর জেডিইউকে ১০ কোটি দিয়েছে। অর্থাৎ, অন্তত বেশি টাকার বন্ড ক্রেতাদের রাজনৈতিক অনুদানের ক্ষেত্রে মতাদর্শের থেকে বিনিয়োগের নীতি অনুসরণ করার প্রবণতা বেশি।

আমাদের তাত্ত্বিক কাঠামোর মুলে আছে এই যুক্তি— বন্ড বা যে-কোনো রাজনৈতিক অনুদানই যদি বিনিয়োগের মতো হয়, তাহলে যে-কোনো বিনিয়োগের মতো এখানেও বন্ড ক্রেতা চাইবেন পার্টির আদর্শগত মালিকানা, যার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে পার্টির নীতি এবং যা স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীর টাকা তার ঘরে সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেবে।

অন্য অনেক কিছুর মতো এও এক তত্ত্ব যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রায় অসম্ভব। কিন্তু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ দেখা সম্ভব— দেখা সম্ভব কোন পার্টি কি টাকা পাচ্ছেন স্বল্প সংখ্যক শিল্পপতির থেকে, নাকি টাকা আসছে অনেকের থেকে। প্রথম ক্ষেত্রে পার্টির নিয়ন্ত্রণ কয়েকটি সংস্থার হাতে থাকার কারণে পার্টির গৃহীত নীতি তাদের স্বার্থে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। নীতির নির্দিষ্ট অভিমুখ অবশ্য বন্ড ক্রেতাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সম্পর্কে নির্দিষ্ট ভাবে না জেনে বলা মুশকিল। দ্বিতীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বন্ড ক্রেতার সংখ্যা বেশি হলে তাদের পছন্দের নীতির মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা থাকতে পারে যা সেই পার্টিকে নির্দিষ্ট নীতি-অভিমুখে যাওয়া থেকে বিরত করতে পারে। এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই এবার আমরা দেখব বিভিন্ন পার্টির ক্ষেত্রে বড় অনুদানকারীদের গুরুত্ব। অর্থাৎ, আমরা জানতে চাইব যে কোনো পার্টি কি কয়েকটি কোম্পানির থেকে বেশির ভাগ টাকাটা পেয়ে যাচ্ছেন নাকি তাঁদের অনেকে মিলে অনুদান দিচ্ছেন। এটা বোঝার জন্য আমরা দুটি পরিমাপ ব্যবহার করেছি। এই দুটিই অর্থনীতিতে অসাম্য সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যবহৃত হয়।

প্রথম পরিমাপে আমরা দেখব কোন পার্টির সর্বোচ্চ ১০ জন অনুদানকারী, মোট অনুদানের কত টাকা দিয়েছেন। বিজেপির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন অনুদানকারী বিজেপির প্রাপ্ত বন্ডের ৩৯.৩৮% কিনেছেন যার মোট পরিমাণ প্রায় ২১১৯ কোটি টাকা। বন্ডের দ্বিতীয় প্রধান প্রাপক তৃণমূলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন অনুদানকারী কিনেছে, তৃণমূলের মোট প্রাপ্ত বন্ডের প্রায় ৭৭% যার মোট পরিমাণ ১১৯৮ কোটি টাকা। অন্যদিকে কংগ্রেস এবং ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বন্ডে প্রাপ্ত মোট টাকার পরিমাণ তৃণমূলের মতোই। বন্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেস যেখানে পেয়েছে ১৫৪৯.৬৭ কোটি টাকা, সেখানে কংগ্রেসের বন্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ ১৩০১ কোটি টাকা এবং ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি পেয়েছে ১১৬৯.৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু সর্বোচ্চ ১০ জন অনুদানকারীর থেকে কংগ্রেস এবং ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি পেয়েছে যথাক্রমে ৪৬% (৫৯৩ কোটি টাকা) এবং ৪৪% (৫১৭.৫ কোটি টাকা)। অর্থাৎ, কংগ্রেস, বিজেপি বা ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির তুলনায় তৃণমূলের প্রাপ্ত টাকা অনেক বেশি কেন্দ্রীভুত কয়েকজন অনুদানকারীর হাতে। অন্যদিকে বিজু জনতা দল এবং তেলুগু দেশম

পার্টির ক্ষেত্রে এই অনুপাত যথাক্রমে ৮১% (৫৮৫ কোটি টাকা) এবং ৭০% (১৪৫ কোটি টাকা)।

এবার আমরা আসি দ্বিতীয় একটি পরিমাপের কথায়। ধরা যাক, আমরা কোনো পার্টির সব বন্ডদাতাদের অনুদানের টাকার অঙ্কের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করলাম। প্রথমে আমরা নিলাম সেই বন্ড ক্রেতাকে যার বন্ড ক্রয়ের অঙ্কের নিচে ওই পার্টির সব অনুদানকারীদের ৯০% রয়েছেন। অর্থাৎ, যিনি এই পার্টির বেশ বড় মাপের অনুদানকারী। অর্থাৎ, এই দাতা সর্বোচ্চ ১০%-এর মধ্যে আছেন। একই ভাবে আমরা সেই দাতাকে নিলাম যাঁর কেনা বন্ডের অঙ্কের নিচে ওই পার্টির সব দাতার ১০% রয়েছেন। ইনি এই পার্টির বেশ ছোটখাটো মাপের অনুদানকারী। এই দুই গোষ্ঠীর কেনা বন্ডের মূল্যমানের অনুপাত যদি দেখি, তাহলে তা দিয়ে ওই পার্টির অনুদানকারীদের মধ্যে ফারাক বা বৈষম্য কতটা সেটা ধরা পড়বে। বিজেপির ক্ষেত্রে এই অনুপাতটি ৮৫। অর্থাৎ, বিজেপিকে কম টাকার বন্ড যারা দিয়েছেন, বেশি টাকার বন্ডদাতারা তার থেকে ৮৫ গুণ বেশি দামের বন্ড দিয়েছেন। তৃণমূলের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৭৫, কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ৬০। অর্থাৎ, বিজেপিকে যারা টাকা দিয়েছেন তাদের মধ্যেকার অসাম্য তৃণমুল বা কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশি।

নির্বাচনী বন্ডের দীর্ঘ ছায়া

আমরা মূলতঃ দুটি প্রশ্নকে সামনে রেখে লেখাটা শুরু করেছিলাম: প্রথমত, সরকারে থাকলে নির্বাচনী বন্ডে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে কিনা এবং দ্বিতীয়ত, যাঁরা টাকা দেন তাঁরা কারা এবং কেন টাকা দেন।

এই দুটি প্রশ্নের একেবারে নিশ্চিত উত্তর যে আমরা দিতে পেরেছি তা বলতে পারি না, কিন্তু খানিকটা আলোকপাত করতে পেরেছি হয়তো। এটা আমরা দেখিয়েছি যে ক্ষমতায় থাকলেই সবসময় বন্ডে টাকা আসে নি (উদাহরণ, এআইএডিএমকে, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা), আবার ক্ষমতায় না থেকেও অনেকে টাকা পেয়েছে (উদাহরণ, টিডিপি)। অন্যদিকে, একই দাতা বিভিন্ন পার্টি, যাদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তাদেরকে বহু টাকা দিয়েছে। এই দুটিকে মিলিয়ে দেখলে এটা মনে হয় যে বন্ডের মাধ্যমে টাকা দেওয়াটা ঠিক উৎকোচ দিয়ে কাজ হাসিল করার মতো ব্যাপার নয়। এখানে উদ্দেশ্য আরো দীর্ঘমেয়াদি, যা সম্ভবত অর্থনৈতিক নীতির গতিপথকে প্রভাবিত করা। আর দীর্ঘমেয়াদে যেহেতু আজকের বিরোধীপক্ষ সরকারপক্ষে পাল্টে যেতে পারে, তাই তাকেও বন্ড অনুদানের মাধ্যমে নিজস্ব প্রভাবের কক্ষপথে রাখা এইসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ— বন্ড ছাড়াও যেখানে টাকা দেওয়ার অন্য উপায় আছে, তাহলে বন্ডের সত্যিকারের গুরুত্ব কী? কাদের জন্যই বা বন্ডের গুরুত্ব বেশি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের চোখ রাখতে হবে বিভিন্ন পার্টির বন্ড এবং অ-বন্ড অনুদানের ওপর। স্টেট ব্যাঙ্কের প্রকাশিত তথ্য থেকে একথা পরিষ্কার যে বন্ডের টাকা বেশির ভাগটাই গেছে বিজেপির পকেটে। কিন্তু অ-বন্ড অনুদানের টাকা? তাও কী বিজেপি-ই বেশি পায় নি? এই প্রশ্নের উত্তর স্টেট ব্যাঙ্কের রিপোর্ট থেকে পাওয়া সম্ভব না। এর জন্য আমাদের দেখতে হবে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম (এডিআর) কর্তৃক প্রকাশিত একটি রিপোর্ট যেখানে তারা বিভিন্ন পার্টির, ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ এর মধ্যে প্রাপ্ত বন্ড এবং অ-বন্ড অনুদানের খতিয়ান প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী এই সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট বন্ডের ৫৭% গেছে বিজেপির পকেটে, যেখানে অ-বন্ড টাকার ৬৭% পেয়েছে বিজেপি। অর্থাৎ, বন্ডের টাকার বিজেপির ভাগ যত, বন্ড বহির্ভূত অনুদানে বিজেপির ভাগ অনেক বেশি। এরপরে আমরা দেখব বিভিন্ন পার্টির মোট অনুদানের কত শতাংশ বন্ডের মাধ্যমে এসেছে। সেখানে বিজেপির বন্ড এবং অ-বন্ড অনুদানের মধ্যে একটা ভারসাম্য আছে— বিজেপি তার মোট অনুদানের ৫২% শতাংশ পেয়েছে বন্ড থেকে। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে মোট অনুদানের ৬১.৫% এসেছে বন্ড থেকে। অন্যদিকে তৃণমূলের ক্ষেত্রে মোট অনুদানের ৯৩% এসেছে বন্ড থেকে, ডিএমকের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৯১% এবং বিজু জনতা দলের ক্ষেত্রে ৯০%। এরপরেই আসে ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি বা বিআরএস (৮০%) এবং ওয়াইএসআর-(সি) (৮০%)-এর নাম। অর্থাৎ, অ-বিজেপি, আঞ্চলিক দলগুলির বন্ড নির্ভরতা অনেক বেশি।

নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান দেওয়ার এই যে বিন্যাসটি ধরা পড়ছে আমাদের বিশ্লেষণে, ভারতের রাজনীতিতে তা একটি নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত বয়ে আনছে বলে আমাদের ধারণা। নির্বাচনী বন্ড বিতর্কের মূল অভিযোগ ছিল যে বন্ডের গোপনীয়তার আড়ালে বিজেপি অনেক টাকা পেয়ে যাবে এবং তার বিনিময়ে অনৈতিক সুবিধা প্রদান করবে বিভিন্ন শিল্প সংস্থাকে। বন্ডের টাকার সিংহভাগ যে বিজেপি পেয়েছে সে নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু বিজেপি অ-বন্ড টাকারও সিংহভাগ পেয়েছে। আপেক্ষিক ভাবে কিন্তু বন্ড থেকে বেশি লাভবান হয়েছে বেশকিছু অ-বিজেপি পার্টি। তার মধ্যে অগ্রগণ্য হল তৃণমূল, ডিএমকে, বিজেডি, টিডিপি, বিআরএস এবং ওয়াইএসআর (সি)। এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফল থেকে বোঝা গেছে যে এক দশক ক্ষমতায় থাকার পরে বিজেপির বিরুদ্ধে যে

একটা ক্ষোভ জমা হচ্ছিল দেশে, ভোটবাক্সে তার প্রতিফলন হয়েছে। নির্বাচনী বন্ডের গোপনীয়তার সুযোগ নিয়ে পুঁজিমালিকরা যেভাবে অ-বিজেপি পার্টিগুলির পেছনে টাকা ঢেলেছেন তাতে বোঝা গেছে যে পুঁজিমালিকদের একটা অংশের বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে, বা অন্তত জনসাধারণের ক্ষোভ আছে এবং সেই জন্যে রাজনৈতিক পাশা পাল্টাতে পারে সেই সম্ভাবনা তাদের মাথায় আছে।

কিন্তু বন্ডের মাধ্যমে একটা বিরাট পরিমাণ টাকা যে ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে, যার একটা বড় অংশ গেছে অ-বিজেপি, আঞ্চলিক পার্টিগুলির কাছে, আমাদের মতে ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে তা একটা বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে আগামী দিনে।

প্রথমত, বন্ডের টাকায় কয়েকটি মাত্র অ-বিজেপি পার্টি উপকৃত হয়েছে। এআইএডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, বহুজন সমাজ পার্টি বা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার মতো গুরুত্বপূর্ণ পার্টিগুলি বন্ডের মাধ্যমে প্রায় কোনো টাকাই পায় নি। এর ফলে আগামী দিনে দলগুলির মধ্যে আর্থিক ক্ষমতার অসাম্য বেড়ে যাবে। বর্তমান যুগে যেখানে অর্থবল রাজনীতি্র গতিপ্রকৃতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে বন্ডে টাকা না পাওয়া পার্টিগুলির পক্ষে রাজনৈতিক লড়াই অনেকটাই কঠিন হতে পারে। এর ফলে নির্বাচনে অর্থপূর্ণ ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এরকম পার্টির সংখ্যা ধীরে-ধীরে কমে আসবে। আমরা ভারতে ইদানীংকালে যেমন দেখছি অর্থনীতির ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে কয়েকটি সংস্থার হাতে, ঠিক তেমনই নির্বাচনী বন্ডের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে পারে কয়েকটি পার্টির হাতে। অন্যদিকে, বন্ডের টাকা থেকে বঞ্চিত পার্টিরা লড়াইতে টিকে থাকার জন্য অন্য ধরণের নানারকম দুর্নীতির আশ্রয় নেবে। খেয়াল করে দেখুন যে তিনটি দল ক্ষমতায় থেকেও বন্ডের মাধ্যমে টাকা পায়নি তাদের মধ্যে দুটি দলের মুখ্যমন্ত্রীরা ক্ষমতাসীন অবস্থাতেও দুর্নীতির দায়ে জেলে গেছেন আর অন্য দলটি ক্ষমতায় ছিল বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে। আমাদের মতে নির্বাচনী বন্ড প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে বড় বিপদগুলোর মধ্যে এটা একটা।

দ্বিতীয়ত, বন্ডের মাধ্যমে যারা টাকা দিয়েছে তারা দেশে বড় পুঁজির প্রতিনিধি। কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে আঞ্চলিক দলগুলি, স্থানীয় ছোট পুঁজির প্রতিনিধিত্ব করে। একভাবে জাতীয় ও আঞ্চলিক দলের যে সংঘাত তা ছোট ও বড় পুঁজির নীতিগত লড়াই-এর একটি প্রতিফলন। বন্ডের মাধ্যমে টাকা ঢালার মাধ্যমে বড় পুঁজি এই সব আঞ্চলিক দলগুলির চরিত্র বদলে ফেলতে পারে। এই দুটি সম্ভাবনার ফলেই দেশে রাজনৈতিক মঞ্চের যে বিন্যাস তার সংকোচন হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলী এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটির সাক্ষ্য বহন করে। আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি সবচেয়ে বেশি বন্ড অনুদান পেয়েছে যে আঞ্চলিক পার্টি সেটি হল তৃণমূল কংগ্রেস— যারা চিরাচরিত ভাবে আঞ্চলিক, ছোট পুঁজির প্রতিনিধি ছিল। সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা সেই অবস্থান পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করছে। একটি সাম্প্রতিক হকার উচ্ছেদ অভিযান যা নিশ্চিত ভাবেই ছোট পুঁজির স্বার্থ-বিরোধী। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, এক চলচ্চিত্র পরিচালকের সঙ্গে ছবির কলাকুশলীদের ফেডারেশনের বিরোধ। ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী যে-কোনো শুটিং-এ একটি নির্দিষ্টসংখ্যক কলাকুশলী নিয়ে শুটিং করতে হয়, অত কলাকুশলী দরকার না থাকলেও। সম্প্রতি এক পরিচালক বাংলাদেশে গিয়ে কম কলাকুশলী নিয়ে শুটিং করে আসেন এবং তার জেরে ফেডারেশন সেই পরিচালককে কাজ করতে না দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ফেডারেশনের এই ধরণের আইন বা পরিচালকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কিন্তু নতুন নয়। ভেবে দেখলে বোঝা যায় ফেডারেশনের এই নিয়ম আসলে মুনাফা কিভাবে প্রযোজক এবং কলাকুশলীদের মধ্যে ভাগ হবে তার দরকষাকষির একটি নিয়ম মাত্র। প্রযোজক যদি কম কলাকুশলী দিয়ে কাজ সারতে পারে তাহলে লাভের বেশির ভাগ অংশ প্রযোজক পাবে আর ফেডারেশনের নিয়মে চললে সেই লাভের একটা বাড়তি অংশ কলাকুশলীদের সঙ্গে ভাগ করতে হবে। যে-কোনো ট্রেড ইউনিয়নের দরকষাকষির সঙ্গে ফেডারেশনের দরকষাকষির আসলে কোনো পার্থক্য নেই। ফেডারেশনের যিনি নেতা তিনি তৃণমূল কংগ্রেসেরই এক প্রভাবশালী নেতা এবং এতদিন পর্যন্ত এই ধরণের বিরোধে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব কলাকুশলীদেরই পক্ষ নিয়েছে। কিন্তু এবার তার ব্যত্যয় ঘটল এবং তৃণমূলের সর্বোচ্চ স্তরের হস্তক্ষেপে পরিচালকের শাস্তি প্রত্যাহৃত হল। এই দুটি ঘটনাই আপাত-দৃষ্টিতে খুব বড় কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাদের মতে এই ঘটনা দুটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে বিপুল অর্থের অনুপ্রবেশ ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতির চরিত্র বদলে দিয়েছে এবং এই দুটি ঘটনা তারই একটি প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

শেষের কথা

নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে যতটা ক্ষোভ জমেছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বন্ডের তথ্যপ্রকাশের পরে বিক্ষোভের অভিব্যক্তি সেই অনুপাতে হয়নি এবং বামপন্থী দলগুলি বাদ দিলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও তা নিয়ে অতটা হইচই করেনি। বন্ড ব্যবস্থায় আশঙ্কার মেঘ দেখেছিলেন যাঁরা, তাঁরা হয়তো

ভেবেছিলেন গত কয়েক বছরে সরকারি নীতির সুবিধা নিয়েছে যে কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠী, বন্ডের পর্দানশীনতার আড়ালে তারাই দেশের কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন পার্টি বিজেপিকেই টাকা দেবে, গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। বন্ড তথ্য বিশ্লেষণের পরে দেখা যাচ্ছে এই আশঙ্কা সবটা মেলেনি। বিজেপির ঘরে বন্ডের টাকার সিংহভাগ গেলেও দাতার তালিকায় প্রত্যাশিত নামগুলির সেভাবে দেখা মেলে নি। আর বিজেপি বাদ দিয়ে অন্যান্য কিছু পার্টিও বন্ড থেকে যথেষ্ট লাভবান হয়েছে।

এখন, তত্ত্ব ও তথ্য সবসময়ে মেলে না। তখন এগোবার দুটি পথ আছে— হয় তথ্যের মধ্যে ভুল খুঁজে বের করা, অথবা, তথ্যকে মেনে নিয়ে তত্ত্বকে পরিমার্জিত করা।

বন্ডবিরোধী নাগরিক সমাজ মূলত প্রথম পথের পথিক । দুটি সম্ভাবনার কথা তাঁরা বলছেন। এক, ভারতীয় ব্যবস্থায় আসল খেলোয়াড় কালো টাকা। বন্ড বা অন্য হিসাবভুক্ত অনুদানের ভূমিকা সেখানে নগণ্য। দুই, আদানি বা আম্বানির মতো শিল্পগোষ্ঠী বেনামে, অন্য ছোট কোম্পানির মাধ্যমে বন্ড কিনেছে। এছাড়া আর একটি সম্ভাবনার কথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে বিজেপির টাকা পাওয়ার আসল হিসেব ২০১৯-এর নির্বাচনের আগে পাওয়া বন্ডে রয়েছে। এই বন্ডের হিসেব বন্ধ খামে সুপ্রিম কোর্টে জমা রয়েছে এবং এসবিআই কর্তৃক প্রকাশিত হিসেবের মধ্যে সেটি অন্তর্ভুক্ত নয়।

এই সম্ভাবনাগুলির সবগুলিই সত্যি হতে পারে। কিন্তু এইসব সম্ভাবনাগুলি প্রমাণ বা খণ্ডন করার মতো কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। আমরা তাই দ্বিতীয় পথটি নেব— চেষ্টা করব প্রকাশিত তথ্যের আলোতে আমাদের তত্ত্বকে পরিমার্জিত করার। আমাদের তত্ত্বের প্রাথমিক অনুমান ছিল যে নির্বাচনী বন্ডের ক্রেতার নাম গোপন রাখার নিয়ম ব্যবসায়িক সংস্থাদের উৎসাহিত করবে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল, অর্থাৎ, বিজেপিকে অর্থ জোগাতে। এই অনুমান পুরোটা ভুল নয়, কারণ, বন্ডের যে টাকা এসেছে তার অর্ধেকেরও বেশি গেছে বিজেপির ঘরে।

কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণ করে যে ছবিটা বেরোচ্ছে তা আরেকটু জটিল। দেখা যাচ্ছে গোপনীয়তার নিয়মের আড়াল দিয়ে, বিজেপির পাশাপাশি টাকা ঢুকেছে কয়েকটি অ-বিজেপি পার্টির ঘরেও। বন্ড অনুদানের টাকার অঙ্কের বিচারে হিসেবে বিজেপির প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি। কিন্তু অর্থসংগ্রহের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে আপেক্ষিক বিচারে এই সব পার্টি বন্ড নির্ভরতায় বিজেপির তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে। বিজেপির মোট অনুদানের অর্ধেক যেখানে এসেছে বন্ড থেকে, তৃণমূল, ডিএমকে বা বিজু জনতা দলের মতো পার্টির ক্ষেত্রে সেখানে বন্ড জুগিয়েছে তাদের মোট

অনুদানের নব্বই শতাংশ বা তারও বেশি। কিন্তু মাত্র কয়েকটি দলেরই ভাগ্যেই বন্ডের অর্থ জুটেছে, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলই বন্ডের মাধ্যমে অর্থসমাগম থেকে বঞ্চিত থেকেছে। নির্বাচনী বন্ডের অর্থ চলাচলের এই যে ছাঁদ, আমাদের মতে তা ভারতীয় রাজনীতিতে এক গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী, যা বুঝতে গেলে নতুন তত্ত্বকাঠামোর লেন্স ব্যবহার করতে হবে।

বন্ডে যে বিরাট পরিমাণ টাকার লেনদেন হয়েছে তা নিশ্চিত ভাবেই রাজনীতির অর্থনীতিতে বড় পুঁজির উপস্থিতি জানান দেয়। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়।

প্রথমত, বন্ডের চলাচলে একথা স্পষ্ট যে বড় পুঁজি বিজেপি বাদ দিলে অন্য দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস ছাড়া কয়েকটি মাত্র পার্টিকেই আর্থিক ভাবে শক্তিশালী করতে উদ্যোগী। এর ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিযোগিতার পরিসর এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক মঞ্চের বিন্যাস সংকুচিত করবে, যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

বন্ড অনুদানের দ্বিতীয় নিহিতার্থটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আঞ্চলিক দলগুলি সাধারণত স্থানীয়, ছোট পুঁজির ওপর নির্ভরশীল। বন্ডের মাধ্যমে সেখানে দখল বসাচ্ছে বড় পুঁজি। বড় পুঁজি যদি আঞ্চলিক দলের নীতির নির্ণায়ক হয়ে ওঠে তবে সেইসব দলের শাসনাধীন রাজ্যের অর্থনীতির কাঠামোতেও নানা রকম ভালো এবং মন্দ বদল আসবে। অর্থনীতিতে ছোট পুঁজির আধিপত্য থাকলে বৃদ্ধির এবং নতুন উদ্বৃত্ত তৈরির সম্ভাবনা কম হয় ।

ভারতীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হল দুই ধরণের পুঁজির সংঘাত। তার মধ্যে একটির ভিত্তি হল বিভিন্ন স্থবির উপাদানের (যেমন জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ) খাজনা এবং তার বন্টন। এই যে বন্টন প্রক্রিয়া তার ভিত্তি হল প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিকাঠামোর ব্যবস্থাপনা। তার একটি অংশ যদি বিশ্বের সর্বাধিক বিত্তবানদের তালিকায় তাদের উপস্থিতি সোচ্চারে ঘোষণা করে, অন্য অংশটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি পরিসরে বিচরণ করে যার উদাহরণ হল প্রোমোটার-রাজ, যার অনেকাংশেই হয়ে থাকে বিভিন্ন আইনবিরুদ্ধ এবং অনৈতিক পথে। তৃণমূল, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, বা সমাজবাদী পার্টির মতো দলের বিরুদ্ধে মুল অভিযোগের কেন্দ্রে তাই থাকে দুর্নীতি এবং তোলাবাজি আর বিজেপির বিরুদ্ধে "সুট-বুট কি সরকার"।

কিন্তু বড় পুঁজির অন্য যে অংশ প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর নয়— মানবসম্পদ বা প্রযুক্তিনির্ভর— তাদেরও উন্নয়ন পথ খুব মসৃণ নয়। তাদের উন্নয়ন প্রকল্পে বৃদ্ধির হার বেশি হতে পারে, কিন্তু একই সাথে তা অদক্ষ শ্রমিকের আয়ের তুলনায় অতিদক্ষ শ্রমিক আর পুঁজিমালিকদের আয় মাত্রাহীন ভাবে বাড়িয়ে তোলে। সেই পথেও তাই এক অন্য ধরণের সামাজিক ক্ষোভের জন্ম হয়।

আমাদের মতে নির্বাচনী বন্ডের চলন, বিভিন্ন আঞ্চলিক পার্টির অর্থ সংস্থানের পরিসরে এই দুই ধরণের পুঁজির প্রতিযোগিতার আভাস বহন করে।

কিন্তু ভোটের ফলাফলে এই প্রতিযোগিতার প্রভাব কী? নির্বাচনী লড়াইয়ে অর্থশক্তি প্রয়োজন, কিন্তু তা সাফল্যের একমাত্র উপাদান নয়। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের ফল সেই ইঙ্গিতই দেয়। বন্ড আনুকূল্যপ্রাপ্ত অনেক দলই ভালো করেছে আর বন্ডের টাকা না পাওয়া অনেক দল খারাপও করেছে। কিন্তু এই দুইয়েরই ব্যতিক্রম আছে। যেমন, বন্ডে অনেক টাকা পেয়েও ওড়িশা থেকে প্রায় মুছে গেছে বিজু জনতা দল। আবার বন্ডের প্রায় কোনো টাকা না পেয়েও উত্তরপ্রদেশে লড়াইতে ফিরেছে সমাজবাদী পার্টি।

মনে রাখতে হবে, বন্ডের টাকা একটি সূচক যা নির্দেশ করে কোন ধরণের পুঁজি কোন একটি পার্টির পেছনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পুঁজি তো শুধু পার্টির পেছনে দাঁড়ায় না। সে সেই পার্টির সাহায্যে নিজের উন্নয়ন প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করে। আগেই আলোচনা করেছি যে ছোট এবং বড় পুঁজির উন্নয়নপথ আলাদা আলাদা ধরণের সামাজিক ক্ষোভ নির্মাণ করে। টাকার পাশাপাশি, ভোটের ফলাফলে সেই সামাজিক ক্ষোভও নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির পতন এবং এবারের লোকসভা নির্বাচনে তার পুনরুত্থানের আখ্যানটি স্মর্তব্য। সমাজবাদী পার্টির পতনের অন্যতম কারণ ছিল বাহুবলীদের পরাক্রম, তোলাবাজি এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি। যোগীরাজ্যে যে সেইসব সমস্যা কমে এবং আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হয়, তা যোগীর অতিবড় সমালোচকরাও স্বীকার করেন। কিন্তু বাহুবলী নিয়ন্ত্রণ বা আইনশৃঙ্খলার যোগীর কোনো জাদু নয়, বড় পুঁজির উন্নয়ন আখ্যানেই তার সূত্র লুকিয়ে আছে। কিন্তু বড় পুঁজির উন্নয়ন প্রকল্পে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হলেও, অসাম্য অনিবার্যভাবে বাড়বে। আমাদের মতে সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি বিরোধিতার হাওয়া আসলে সেই অসাম্য-বিরোধী প্রতিক্রিয়া। অবশ্যই, আমাদের এই আলোচনাটি মূলত তাত্ত্বিক এবং সদ্যবর্ণিত প্রক্রিয়াটি যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আর্থিক অসাম্য, তোলাবাজির পরিমাণ এইসব নিয়ে আরো অনেক তথ্য দরকার যা এই মুহূর্তে সহজলভ্য নয়।

আমাদের গোটা আলোচনাটির মূল প্রতিপাদ্য তবে কী?

নির্বাচনী বন্ড রাজনৈতিক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবে— এরকম একটি শঙ্কার কথা উঠে এসেছে বহু আলোচনায়। শঙ্কাটি অমূলক নয়। কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণে বন্ডের তথ্য ভারতের রাজনীতিতে তার থেকে অনেক গভীর এক পরিবর্তনকে চিহ্নিত

করছে। উদারপন্থী অর্থনীতির অভিঘাতে ভারতের রাজনীতিতে পুঁজির পুরোনো বিন্যাস ভেঙে এক নতুন বিন্যাস তৈরি হয়েছিল গোটা নব্বই-এর দশক জুড়ে। সেই প্রক্রিয়াতে তৈরি হয়েছিল একটার পর একটা কোয়ালিশন সরকারের অস্থিরতা। নব্বই-এর দশক পার করে ভারতের রাজনীতিতে একটা ভারসাম্য বিন্দু তৈরি হয়েছিল। বন্ডের তথ্যের প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে মনে হচ্ছে সেই পুরোনো ভারসাম্য ভেঙে তৈরি হতে চলেছে এক নতুন ভারসাম্যবিন্দু। নব্বই-এর দশক থেকে অনেক দূর চলে এসেছি আমরা। এই কুড়ি বছরে পালটে গেছে বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্য, এসেছে কৃত্রিম-মেধানির্ভর প্রযুক্তি।

সেই পৃথিবীতে, ভারতের রাজনীতির নতুন ভারসাম্য বিন্দু কেমন হবে? এর নিশ্চিত উত্তর আমাদের কাছে নেই। আমরা শুধু হাওয়া-মোরগের মতো একটা পরিবর্তনের আভাস পাচ্ছি।

[এই লেখাটিতে ব্যবহৃত নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের আরো বিস্তারিত বিবরণ আমাদের *The India Forum* পত্রিকায় জুলাই ৭, ২০২৪-এ প্রকাশিত ‘Electoral Bonds, Incumbency Advantage, and Concentration of Political Power’ প্রবন্ধটিতে পাওয়া যাবে।]